Vol. 40 | No. 3 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ

Volume	40
Issue	3
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Baitullah Quaderee
Published online	February 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v40i3.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i3.10
Pages	205-236
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ষাটের দশকের কবিতা : বিষয় ও প্রকরণ

বায়তুল্লাহ কাদেরী

১. পাপবোধ, পঙ্কিলতার গ্লানি, অবক্ষয়িত অন্তরাত্মার প্রতীতিতে একগুচ্ছ রোমশ অন্ধকারে বিচ্ছুরিত দ্যুতির মতো ছিটকে পড়েছেন ষাটের কবিরা। বিরুদ্ধ সময়, অনিকেত নিরবলম্ব অবস্থান, অগ্রজে অবিশ্বাস ক্রমান্বয়ে তাঁদের করেছে সংঘবিচ্ছিন্ন, আত্মমৈথুনে লিপ্ত, প্রথাবিরোধী, আত্মভুক চেতনায় উজ্জীবিত। কবিতার হৈ-চৈ, রাস্তা পোড়ানোর গন্ধ, বারুদের উত্তাপ, লাশ ও ডুঁয়ো পিঁপড়ের ঠান্ডা লড়াই, এবং সর্বোপরী লিবিডোর অন্তর্চাপ এসবই ষাটের কবিতার বহুল অনুষঙ্গ। ষাটের কবিদের কাছে তাই অগ্রাহ্য হয়েছে ধর্মবোধ, নীতিবোধ। জন্মলগ্নেই এঁরা প্রচলরীতির কাব্য স্রোতে অভিযোজন অক্ষম, স্থির জীবনদর্শনে পরাঙ্মুখ, পূর্ববর্তী কবিদের মতো শুধু ইউরোপীয় আধুনিক নন্দনতত্ত্বে আস্থা প্রদর্শনে গভীরভাবে অনীহ। কবিদের এ মানসিকতার মূলে জাতিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিই প্রভাবক হিসেবে সক্রিয় থেকেছে। কারণ "পূর্ব বাংলার ছয়দশক পুঁজিবাদীদের শক্তিসঞ্চয়ের গুপ্ত প্রস্তুতিকাল, আর ইউরোপে তা পতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে। সুতরাং অসম সমাজের দুই আদর্শ প্রান্তে জীবনের জ্যা পরাতে অগ্রসর হলেন ছয় দশকের কবিগণ।"[১] সুতরাং ষাটের কবিরা একদিকে যেমন দেশজ জীবনবিন্যাসে, প্রচল-বিশ্বাস ও মূল্যবোধে স্থিতিপ্রাজ্ঞ হতে পারেননি তেমনি অন্যদিকে সমকালকে আত্মস্থ ও মূল্যায়ন করে সুস্থিত দার্শনিক মীমাংসায় পৌঁছানো তাঁদের অন্বিষ্ট ছিল না "এদেশে বিজ্ঞান আছে বিজ্ঞানে বিশ্বাস নেই; ধর্ম আছে, তা বহু ব্যবহৃত; রাষ্ট্র আছে, রাজনীতি নেই; আদর্শ আছে অথচ কর্মযোগ নেই। ফলত অন্ধকার আচ্ছাদিত দৃষ্টিতে তাঁরা কাল সমাজজীবনকে দেখলেন। এ-দশকের কবিকূলকে তাই 'জন্মান্ধ' বলা অসার্থক নয়।"[২] ষাটের কবিদের এই আত্মচারী, আত্মবিধ্বংসী, বোহেমীয় জীবনাচরণ তাঁদের জীবন-ঔদাসীন্যের বিলাসিতা নয় বরং এর সঙ্গে তৎকালীন সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ই সম্পৃক্ত। অবরুদ্ধ আইয়ুবী 'কালোদশক', পাকিস্তানি অখন্ডতার শ্লোগান, ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, বামপন্থী আন্দোলনের বিভক্তি, আমেরিকান পুঁজির বিস্তারে পূর্ববর্তী কবিদের বিচরণ প্রভৃতি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষঙ্গসমূহই ষাটের কবিদের করেছে শৃঙ্খলিত ও প্রতিবাদমুখর। এ-দশকের রাজনৈতিক

প্রেক্ষাপটও দারুণ অস্থিতিশীল। আইয়ুব সরকারের দমননীতি, 'মৌলিক গণতন্ত্রী', শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, নতুন শিক্ষাকমিশন রিপোর্টপ্রকাশজনিত পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজের সাংগ্রামিক পটভূমি, বাঙ্গালির স্বায়ত্ত শাসনের দাবি প্রভৃতির হল্লামুখরতায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত। আর এ সঙ্গে বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাও হয়ে পড়ে খন্ডিত, "পুনর্জীবিত হয় ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা এবং অখন্ড পাকিস্তানের ধারণা। বুদ্ধিজীবীরাও আত্মবিক্রয় ও প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে গ্রহণ করেন সুবিধাবাদী ভূমিকা। অর্থাৎ ষাটের দশকের এই উপপর্বটি বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে কখনোই সদর্থক চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারেনি, না সংগ্রামে না চেতনায়।"[৩] সেকারণে কবিরাও সমাজ জীবন ও স্বদেশকে মূল্যায়ন করলেন নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে, But we are helpless, Simply undone. We have no other alternative except SELF-DESTRUCTION. Death is our darling, but not those bloody ladies who are loitering before our eyes.

We are, for no time, interested in politics and newspapers. Then, what do we want? NOTHING, NOTHING,-we want nothing from our bloody society.

We are exhausted, annoyed, tired and 'sad'.[৪]

বস্তুত স্যাড জেনারেশনের এই মেনোফেস্টোর মতোই ষাটের কবিরা আত্মবিনাশে সচেষ্ট হন আপন আপন সৃষ্টি প্রমত্ততায়। ষাটের কবিদের কাব্যপ্রচেষ্টার সূত্রপাত এরকম কতিপয় লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করেই। কৃত্তিবাস, হ্যাংরি জেনারেশনের জীবনবোধের মতই ষাটের কবিরা 'কণ্ঠস্বর' 'স্বাক্ষর',, 'সাম্প্রতিক', 'প্রতিধ্বনি', 'বক্তব্য', 'স্যাড জেনারেশন' 'যুগপৎ' প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনে উদ্ভাসিত করেন আত্মপ্রতিকৃতি। এসব পত্রিকা প্রায়শই ক্ষণজীবী, ব্যতিক্রমী, আপোসহীন ও স্বেচ্ছাচারী। মূলত ষাটের দশকেই যুদ্ধোত্তর ইউরোপের পরাবাস্তববাদ, প্রকাশবাদ, অস্তিত্ববাদের মতো শিল্প-আন্দোলন এবং আমেরিকার বীট জেনারেশনের হতাশাবাদী আন্দোলনও অনুপ্রবেশ করে বাংলা কবিতায়। ষাটের এই দোদুল্যমান, অস্থির সময়ে যাঁরা কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, আজীজুল হক, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা ও আবুল হাসান উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রত্যেকের কবিতায়, কাব্যভাবনায় রয়েছে আত্মস্বীকৃতি, পাপবোধ এবং তজ্জনিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার, শয়তান ও ঈশ্বরের সুপ্রাচীন দ্বন্দ্ব। বোদলেয়ারীয় ক্লেদজ নৈঃসঙ্গ্য ও আত্মরোমন্থন এঁদের কবিতায় বিস্তৃতি পেলেও ঝলসে উঠেছে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, অস্তিত্বঅভীপ্সু রাজনীতি চেতনা, যদিও তা সুগভীর জীবন-জিজ্ঞাসিত

নয়। অন্ধকারে সরীসৃপসদৃশ অভিব্যক্তি, পাপবোধে স্থিতি, অপরাধ প্রবণ আত্মস্বীকরণ, দেশজ মৃত্তিকামূল-অন্বেষী শিকড়বিস্তারী চলৎ স্পৃহা তাঁদের কবিতায় লক্ষণীয়। ষাটের কবিরা যতই পূর্বজ-অস্বীকৃত হোন, যতই প্রথাবিরোধী অনৈয়ায়িক হোন, তাঁদের রক্তেও প্রবহমান বাংলা কবিতার ধারাবাহিক ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট। মূলত তিরিশের কবিদের (কিয়দংশ পঞ্চাশ) মধ্যেই তাঁদের কাব্যধারা স্রোতায়িত।[৫] বস্তুত রক্তাক্ত সমকাল, উন্মূলিত অস্তিত্বসঙ্কট, অপসৃয়মান সময়ের ক্ষিপ্রগতি, পরিবর্তিত মূল্যবোধজনিত নৈঃসঙ্গ্যানুভূতি, ব্যক্তিক প্রেম এবং দূরতম নষ্টালজিক প্রবণতা এ সময়ের কবিতায় মূর্তরূপ পেয়েছে।

বিষয় ও প্রকরণ অন্বেষায় ষাটের দশক বাংলাদেশের কবিতায় অভিনব কবিদের বিচিত্র অনুসন্ধিৎসু পরিক্রমার স্মারক। একদিকে ইউরোপীয় জীবনদর্শন, ফরাসি প্রতীকবাদী সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব, অন্যদিকে উৎকেন্দ্রিক জীবন, স্ব-সমাজ ও স্বাদেশিক প্রেক্ষাপটই কবিদের করেছে বিচিত্রমুখী। ষাটের কবিরা সময়কে দেখেছেন ডালির বিগলিত সময়যন্ত্রের ক্রমভঙ্গুরতায়, সমাজকে দেখেছেন কসমোপলিটন লন্ডন, প্যারিসের উজ্জ্বল বর্ণবিভায়, শাহরিক জীবনের ছন্দকে আবিষ্কার করেছেন বোদলেয়ারীয় 'ক্লেদজ কুসুম' ও অবক্ষয়িত অন্ধকারে। বস্তুত রাষ্ট্রিক উপনিবেশ, অবরুদ্ধতা, অস্তিত্বহীনতার নিরবলম্বতাকে তাঁরা ধারণ করেছেন কবিতার শরীরে। ফলত একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবির প্রকরণ হয়ে উঠেছে স্ব-স্ব মনোভূমির প্রত্নবীজ। এ-কারণেই শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, আবুল হাসান কিংবা আবদুল মান্নান সৈয়দ একই দশকের কাব্য সাধনায় লিপ্ত হয়েও প্রকরণ ও মেজাজে ভিন্ন।

খ. অস্তিত্ববাদ (Existentialism) ষাটের কবিতায় ফেলেছে ভারনত ছায়া। প্রবল পৌরুষে অস্তিত্বসচেতন হয়ে উঠেছেন কেউ কেউ। বাংলা কবিতায় অস্তিত্ববাদের প্রবল প্রকাশ এ-দশকেই লক্ষযোগ্য। এ-অস্তিত্বচেতনা এসেছে দ্বৈরথ সূত্রে একদিকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের বিশেষত জ্যাঁ পল সার্ত্রের (Jean-paul Sartre) জীবনদর্শন থেকে অন্যদিকে বিরুদ্ধ সময়, শিল্পিমানসের নৈঃসঙ্গ্য ও আত্মপ্রকাশের অন্তর্চাপ থেকে। ডেনমার্কের দার্শনিক কিয়ের্কে গার্ড এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেও একে বিশ্বব্যাপী দার্শনিক ও সাহিত্যিক মতবাদরূপে পরিচিত করে তোলেন ফরাসি দার্শনিক সার্ত্রে। মূলত সার্ত্রে তাঁর সাহিত্যে ও চিন্তনে মানুষের স্বাধীনতার কথাই ব্যক্ত করেছেন। মানুষ তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে কোন সঙ্কট মুহূর্তে নির্বাচন ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং এ নির্বাচন ক্ষমতার মাধ্যমেই মানুষ তার ভাল ও মন্দের ফল ভোগ করতে পারে। আসলে ঐশ্বরিক essence এর মূলে অস্তিত্ববাদীরা আঘাত হানলেন মানুষের এই নৈর্ব্যচনিক স্বাধীনতার মধ্যে। বস্তুত এ-চেতনাই ষাটের কবিতায় অস্তিত্ববাদের

অভিমুখী করেছে কবিদের। কিন্তু ষাটের কবিতায় অস্তিত্বচেতনার অন্তর্মূলে দার্শনিক মীমাংসা সচেতন-প্রসূত নয়। বরং উন্মুলিত অনিকেত চেতনাই দায়ী। কারণ "গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এ সময়ে শুরু হলেও বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা, স্বার্থপরতা, ঐক্যহীনতা, সামন্তশ্রেণীর পুনর্গঠন ও সরকারের রাজনৈতিক কৌশলের কাছে পরাজিত হয় বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠী। আর এরই পরিণাম হিসেবে স্ফীতকায় শিক্ষিত মানবতাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুভব করতে শুরু করে অস্তিত্বের তীব্র সংকট।"[৭] সুতরাং এখানে রাজনৈতিক চেতনা ক্রিয়াশীল থাকলেও তা হয়েছে মিছিলের ভাষা, ক্ষণজীবী কণ্ঠস্বরের মতো বাতাসে বিলীন, কখনো বা আত্মহুংকারে কুণ্ডলায়িত। ফলত এসব কবিতা প্রায়শঃই দর্শনের প্রশ্নে অগভীর, মতাদর্শগতভাবে পারম্পর্যরহিত। এ সীমাবদ্ধতা কোন প্রতিভাগত সীমাবদ্ধতা নয় বরং যুগমানসই এর জন্য দায়ী। রাজনৈতিক বৈষম্য ও অবদমনে শিল্পসত্তার অনিশ্চয়তা তাঁদের কবিতার দর্শনকে প্রগাঢ় রূপ দিতে পারেনি। জীবনের মৌল চাহিদার নৈষ্ঠিক সাংগ্রামিক চারিত্র্য এবং মনোবল ষাটের কবিদের স্বাভাবে অনুপস্থিত। বস্তুত হঠাৎ সচকিত ও পারিপার্শ্বিক সচেতনতা থেকে যে সমাজ অভিজ্ঞানের মৌল চাহিদার কথা উত্থাপিত হয় তা হাল্কা রোমান্টিসিজমে পর্যবসিত, আত্মসমাহিত নারী সৌন্দর্যের উত্তেজক বাঁকে। রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান প্রমুখের কবিতায় এর নির্দশন প্রচুর। যেমন–

১.

অবশেষে যথাক্রমে খাবো ঃ গাছপালা নদীনালা
গ্রামগঞ্জ ফুটপাত নর্দমার জলের প্রপাত
চলাচলকারী পথ চারী নিতম্ব প্রধান নারী
(রফিক আজাদ, ভাত দে হারামজাদা)

২.

কিছুই শোনে না কেউ তলপেটে অনাস্বাদিত বিহ্বল কাম
আত্মার ভেতরে ওড়ে নীলমাছি বিরক্তির, মগজে উদ্যান।
(শহীদ কাদরী, পাশের কামরার প্রেমিক, উত্তরাধিকার)

৩.

আমারও ভ্রমণ পিপাসা আমাকে নারীর নাভিতে ঘুরিয়ে মেরেছে
আমিও প্রেমিক ক্রবাদুর গান স্মৃতি সমুদ্রে একা সাম্পান হয়েছি
(আবুল হাসান, গোলাপের নিচে নিহত কবিকিশোর, যে তুমি হরণ করো)

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তগুলোর প্রথমটিতে এই ক্ষুধার্ত উন্মাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটে মূলত নিতম্ব প্রধান নারী'তে, আর এ-কারণেই তার আগ্রাসী ক্ষুণ্নিবৃত্তি। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে কবির চিৎকার বা আহ্বান আত্মরতির বিহ্বলতায়। কারণ শরীরব্যাপী যে ক্ষুধা তার অস্তিত্বঘোষণাতেই কবির অন্বিষ্ট শিল্পঅন্বেষা। সর্বশেষ দৃষ্টান্তে ভ্রামণিক কবির গন্তব্য নারীর নাভিমূল। বস্তুত এ অস্তিত্বমূলত নারীক্ষুধারই নামান্তর। নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় তারই স্বীকরণ–

এ কোন নারী গ্রাস?
এ কোন্ বিকৃত বোধ আজকাল পেয়েছে আমাকে?
আমি চালের আড়তকে নারীর স্বল্পতা বলে ভ্রম করি
(সর্বগ্রাসী হে নাগিনী, কবিতা, অমীমাংসিত রমণী)

এ-সঙ্গেই আসে নৈঃসঙ্গ্যবোধ, সঙ্ঘবিচ্ছিন্ন চেতনা। অস্তিত্বের বিপন্নতা শিল্পসত্তার অন্তর্মূলে নিয়ে আসে অবরুদ্ধতা ও অনিকেত নৈঃসঙ্গ্য, ঈশ্বরবিহীন স্বাধীন মানুষ পালাতে থাকে সমাজ সংস্কৃতি ও লোকালয় থেকে। হেগেল একে দেখেছেন মানুষের ধর্ম-চিন্তনের মধ্যে। ধর্ম হচ্ছে মানুষের আত্মবিচ্ছিন্নতা, যা তাকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।[৮] বস্তুত হেগেল এ বিচ্ছিন্নতাকে তাঁর তাঁর ভাববাদী মানসিকতায় একীভূত করে দেখেছেন। কিন্তু মার্কস একে ব্যাখ্যা করেছেন বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। মার্কসের মতে, কর্ম ও কর্মপদ্ধতি ও উৎপাদন বস্তুর মধ্যে মানুষ যখন অনুপ্রবেশ করলো সৃষ্টি করলো উৎপাদক, তখন থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে বস্তুর মধ্যে।[৯] সার্ত্র একে মানুষের সত্তাবিচ্ছিন্নতার সঙ্গে একাত্ম করেছেন। আধুনিক মানুষের সম্ভবত সবচেয়ে বড় সমস্যা তার আত্মবিচ্ছিন্নতা। সত্তার বিচ্ছিন্নতায় মানুষের অসহায়ত্বই প্রকট হয়ে ধরা দিলো সার্ত্রের বক্তব্যে। কেউ কেউ এ-বিচ্ছিন্ন চেতনার উৎস অনুসন্ধানে আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[১০] সুতরাং ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বের মধ্যে মানুষ যেখানে ভয়াল নৈঃসঙ্গ্যে নিপতিত ফ্রয়েড তাকে লিবিডোর মধ্যে উপলব্ধি করেছেন। বোদলেয়ার একে বলেছেন invincible taste for prostitution' এবং এর উৎস হিসেবে তিনি মানুষের horror of solitude-কেই নির্দেশ করেছেন।[১১] ষাটের কবিরা মূলত এই নাগরিক নৈঃসঙ্গ্যকেই রূপায়ণ করেছেন কবিতায়। কখনো কখনো এই বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে আত্ম-অভিজ্ঞতা সংযোজিত হয়ে সৃষ্টি করেছে নতুন মাত্রা। যেমন

১.
অবশেষে জেনেছি মানুষ একা
জেনেছি মানুষ তার চিবুকের কাছে ভীষণ অচেনা ও একা
(আবুল হাসান)

২.

আমি শুধু
একাকী সবার জরার মুখোমুখি
এবং আরো একজনের চোখে দেখি
লক্ষ সূর্যের আসা-যাওয়া এবং সেও একা
আমারই আত্মার মত
প্রাঙ্গণের তরুণ কুকুর
(শহীদ কাদরী, এই শীতে, উত্তরাধিকার)

বস্তুত এই বিচ্ছিন্নতাবোধ কখনোই অস্তিত্ববৈমুখ্য নয়। বরং এর সঙ্গে প্রযুক্ত ব্যক্তির সুগভীর অস্তিচেতনা। কুন্ডলায়িত সমাজ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্ব সংরাগজনিত আকণ্ঠ নিমজ্জনই ব্যক্তিকে করে দেয় সংঘবিচ্ছিন্ন। একধরনের বিচ্ছিন্ন চেতনায় ব্যক্তি আলাদা হতে থাকে সমাজ থেকে, সভ্যতা থেকে, এমন কি নিজের বোধ এবং মেধা থেকেও। জীবনানন্দ দাশও এই বিচ্ছিন্ন চেতনাকে লালন করেছেন শৈল্পিক যন্ত্রণায়-

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
(বোধ, ধূসর পান্ডুলিপি)

সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তিক অনুভূতিকে ব্যক্তি তখন তার সপক্ষে দাঁড় করাতে সচেষ্ট হয়। সুধীন্দ্রনাথও এ-বিচ্ছিন্নতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন যুদ্ধোত্তর উটপাখির মরুভূমির একাকিত্বে-প্রাক পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত/বিগত সবাই তুমি অসহায় একা, (উটপাখি, ক্রন্দসী) সেকারণেই কবিতাতেও একেকটি বোধ, অনুভূতিকে ব্যক্তিক আদলে বিচ্ছিন্ন করে অবয়ব দানের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। আজীজুল হকের কবিতায় এরই একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর প্রেম, যন্ত্রণা, জ্ঞান, মস্তিষ্ককে আলাদা করে অবয়ব দিতে চান

একটি যন্ত্রণা পড়ে আছে। যেন এক মানুষ শুয়ে আছে
শয্যায়। যেন এক প্রবীণ সমাজ
আর সব সেকালের সমাজের মত
ছাড়বে খোলস,

এবং ছাড়তে গিয়ে মরে পড়ে আছে
সুনিপুণভাবে।
(যন্ত্রণা, ঝিনুক মুহূর্তে সূর্যকে)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে ব্যক্তির সমষ্টিসত্তাকে বিচ্ছিন্নভাবে নির্দিষ্ট করার চেষ্টা চলেছে। যন্ত্রণাদগ্ধ মানুষের যন্ত্রণার মাত্রাকে বিভিন্ন মাত্রায় দেখেছেন কবি। মানুষ থেকে তার যন্ত্রণাকে আলাদা করে, অনুভূতিকে শরীরী-চিত্রে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে কবি তাঁর অসহায়ত্বকে মূর্ত করে তুলেছেন, এবং 'যেন এক মানুষ শুয়ে আছে শয্যায়' এই বিমূর্ত অসহায়ত্বকেই দ্বিতীয় একটি 'যেন' উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে সমাজে সম্পৃক্ত করে অর্থাৎ সামষ্টিক চেতনায় সম্পৃক্ত করতে গিয়ে অসহায়ত্বের শিকার হয়েছেন। কারণ খোলস ছাড়ার আগেই তাকে গ্রাস করেছে মৃত্যু, আরেক 'সুনিপুণ' বিচ্ছিন্নবোধ।

অস্তিত্বসঙ্কটজনিত এই একাকিত্ববোধ কখনো কখনো কবিকে পলায়নপ্রবৃত্তির দিকেও ঠেলে দেয়। মানবিক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে শুদ্ধসত্তায় authentic being) উত্তীর্ণ হতে না পেরেই সম্ভবত পলায়নবৃত্তির সিদ্ধান্তে কবি পৌঁছান। দৃষ্টান্ত–

রাতদিন মারখাচ্ছি। খাক গিয়ে আমি
ভেবেছি পালাবো, ক্ষতমুখ, রক্তপাত নষ্টচোখ এরকম
আরো কিছু স্বাভাবিক চিহ্ন নিয়ে পালাবো কোথাও।
(আজীজুল হক, নিরুদ্দিষ্ট একজন, ঘুম ও সোনালি ঈগল)

ষাটের কবিতায় নগর বা শাহরিক অনুষঙ্গ কবিদের চৈতন্যে সৃষ্টি করেছে নবতর মাত্রা। নাগরিক অনুসঙ্গবহ শব্দ, চিত্রাত্মক বর্ণনা, [illegible] শাহরিক কৃত্রিমতা ষাটের কবিতায় পেয়েছে ভিন্নতর চরিত্র। ষাটের কবিরা শহরকে দেখেছেন এলিয়ট কিংবা বোদলেয়ারীয় দৃষ্টি দিয়ে। তাঁদের অঙ্কিত শহরে লন্ডন, প্যারিসের উজ্জ্বল বর্ণবিভার পাশে স্যাঁতসেঁতে নোংরা ক্লেদ, গ্লানিমা ও অবক্ষয়ে পরিপূর্ণ। শহর ইটের গাঁথনিতে শক্তপ্রাণ ও বড়হীন। শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান প্রমুখের কবিতায় শহরের অবক্ষয় [illegible], অসহায়ত্ব ক্লেদ-পঙ্কিলতা [illegible]

১.
দূর একটি ম্যানসনে, গাড়ি বারান্দায়
হল্লামুখর জনতার অংশ [illegible] ভুগ্না
এই রাত্রিতে, যখন আকাশ মেঘার্দ্র, দুর্মুখ আর [illegible],

উৎসবের নাগরদোলায় অন্তহীন মানুষের ওঠা-নামা
যদিও পরনে সবার
শাদা শাদা নিষ্করুণ বিষণ্ন, ঠান্ডা, মরা জামা!
(শহীদ কাদরী, ভরা বর্ষায় ঃ একজন লোক, উত্তরাধিকার)

২.
এই অগ্নির শহরে দুষ্ট পানির মতো বাণিজ্য করে আত্মা...
হায় সবাই কেবল নিজের পাশের মানুষটিকে ঠেলে দিতে
হয়ে ওঠে তাপের শীর্ষদেশ, আত্মার দোকানদার, স্বভাবের
কুচকাওয়াজ।
(আবদুল মান্নান সৈয়দ, টুকরো টুকরো মৃত্যু, জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ)

নগরীর এই বিপ্রতীপতাকে ঘনীভূত করে তোলে নারী। ষাটের কবিতায় নারীর উপস্থিতি কবিদের রিবংসাসঞ্জাত প্রেমের মধ্যে প্রাপণীয়। নারী সেখানে প্রায়শঃই আসবাবসদৃশ, বহুব্যবহৃত 'মেয়েমানুষ'। কবিদের রিবংসার আত্মপরিক্রমা এই নারীকে কেন্দ্র করেই। পঞ্চাশের কবিদের কাছে নারী যেখানে পেয়েছে সৃষ্টিশীলা, ফলবন্তা শিল্প প্রমূর্তি, ষাটের কবিদের কাছে নারী শয্যাসঙ্গিনী। মদ, জুয়া, স্বেচ্ছাচারী মানসিকতায় ক্লান্ত, অবক্ষয়িত ও ক্লীবত্ব প্রাপ্ত ষাটের প্রেম -Death is our darling, but those bloody ladies who are loitering before our eyes[১২] সত্তারহিত, দেহসর্বস্ব এই রতিপ্রেমে বোদলে[illegible] নিমজ্জনই একমাত্র প্রত্যাশক নয়, বরং অস্থিতিশীল, ক্রম[illegible] অস্তিত্বের জন্যই প্রেম পায়নি মুহূর্তিক স্থৈর্য। সুতরাং নারী মাত্রই দেহজ কামনাবাসনার আধার, লৈঙ্গিক স্পৃহার মাধ্যম। বুদ্ধদেব বসু নারীর শরীরের অভ্যন্তরে তার কুৎসিত কঙ্কালকে লক্ষ করেছেন-

নতুন ননীর মতো তনু তব? জানি তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে কুৎসিত কঙ্কাল...
(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তার : খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থি শ্রেণী
(প্রেমিক, বন্দীর বন্দনা)

আর ষাটের কবিরা নারীকে গ্রহণ করেছেন গণিকারূপে। গণিকাদেহে রিরংসা ও বলাৎকারে তারা নিমজ্জিত হয়ে শুদ্ধ হতে চেয়েছেন। বোদলেয়ার যেমন শুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন যৌনতা, সুরা অহিফেন ও গঞ্জিকার মাধ্যমে। "কেমন করে, পাপ

থেকে স'রে এসে, মানুষ পুণ্যের দিকে পা ফেলতে পারে, তাঁর মনে এই চিন্তা ছিল নিত্যজাগ্রত কোনো সঙ্ঘবদ্ধ উপায়ে, কোনো সামাজিক 'প্রগতি'র দ্বারা তা সাধিত হ'তে পারেনা, তা সম্ভব শুধু ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তিরই মধ্যে।[১৩] সুতরাং বোদলেয়ার চৈতন্যের তীক্ষ্ণতা ও উত্তরণের প্রয়োজনেই নিজেকে সমর্পণ করেছেন এক পরীক্ষায়। তাঁর যৌনতা মূলত "আত্মনির্যাতনেরই একটি উপায়" মাত্র।[১৪]

সে রাতে ছিলাম কদাকার ইহুদিনীর পাশে
পাশাপাশি দুটো মৃতদেহ যেন এ ওকে টানে
ব্যর্থ বাসনা; পণ্য দেহের সন্নিধানে
সে-বিষাদময়ী রূপসী আমার স্বপ্নে ভাসে।
(শার্ল বোদলেয়ার , সে-রাতে ছিলাম, ঐ)[১৫]

এই আত্মনির্যাতনের উপায়রূপেই ষাটের কবিরা নিমজ্জিত হলেন দেহজ প্রেমে। শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, আবুল হাসান প্রমুখের প্রেমে এই দৈহিক রতিবিলাসিতাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেমন,

১.
রাত্রে তোমাকে স্বপ্নেও দেখি
গণিকালয়ের সারিতে একা
আমারি মুখের মতন হাজার
মুখের মিছিল
তোমার জন্যে প্রতীক্ষায়
(শহীদ কাদরী, প্রিয়তমাসু, উত্তরাধিকার)

২.
আমারও ভ্রমণ পিপাসা আমাকে নারীর নাভিতে ঘুরিয়ে মেরেছে
আমিও প্রেমিক ক্রবাদুর গান স্মৃতি সমুদ্রে একা সাম্পান হয়েছি আবার
সুন্দর জেনে সহোদরাকে সঘন চুমোয় আলু থালু করে খুঁজেছি শিল্প।
(আবুল হাসান, গোলাপের নিচে নিহত কবি কিশোর, যে তুমি হরণ করো)

বস্তুত এই নারী ও সত্তারহিত স্থূল প্রেমের হাত ধরে আসে দুঃখ। ষাটের কবিতায় দুঃখবোধ একটি পুনরাবৃত্ত অনুষঙ্গ। আবুল হাসান এ-ধারার প্রধান কবি। খ এসেছে অপরাধবোধের সূত্রে। স্বীকারোক্তিমূলক মানসিকতাও এর জন্য । বাংলা কবিতায় স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা চর্চার বিস্তার মূলত ষাটের কেই। পঞ্চাশ-ষাটের আমেরিকান কবিরাই এ-ধরনের কবিতার স্রষ্টা। রবার্ট

লাওয়েল (Robert lowell), অ্যান সেক্সটন (Anne Sexton) সিলভিয়া প্লাথ (Sylvia Plath) প্রমুখের হাতে এ ধারার কবিতা চরম উৎকর্ষে পৌঁছায়। স্বীকারোক্তিমূলক কবিতায় কবির আত্মজৈবনিক অন্তর্দহন, এবং অন্তর্মুখী প্রবণতার সঙ্গে বহির্জাগতিক অভিযোজন -অক্ষমতাজনিত সংক্ষোভই তার উচ্চারণকে করে বিবৃতিমূলক, স্বীকারোক্তিপ্রবণ। সেক্সটন তাঁর কবিতায় মাতৃত্ব, নারীর দৈহিক সমস্যা, যৌনতা মনস্তত্ত্ব ও শরীরী সম্পর্কের খুঁটিনাটি বিষয়ে স্বীকারোক্তি করেছেন। বাংলা কবিতায় ষাটের দশকে এ ধারারই কবিতার আদলে স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা রচনার প্রয়াস কবিদের মধ্যে দুর্লক্ষ্য নয়। রফিক আজাদ, আবুল হাসান প্রমুখের কবিতায় বর্ণনাত্মক সরল স্বীকারোক্তি এসেছে আত্মগ্লানিমাবোধ থেকেই। যেমন,

দিন দিন আমার অধঃপতন পাহাড় কেবলি উঁচু হচ্ছে,
এত দাহ এত পাপ!
আমার পায়ের নখ থেকে মাথার প্রতিটি চুলে এত অপরাধ!
(আবুল হাসান, অনুতাপ, যে তুমি হরণ করো)

এই অপরাধ প্রবণতার কারণেই আসে দুঃখ। বোদলেয়ারীয় নির্বেদ, বিষাদ ও বিষণ্নতা তাঁদের কবিতায় এই দুঃখবোধের উদ্বোধক বলে মনে হতে পারে। 'রূপসী' ও 'বিষাদময়ী' কে বোদলেয়ার একই প্রান্তিকে ধারণ করতে চেয়েছেন— হও রূপসী, বিষাদময়ী! অশ্রুজল! নতুন-রূপে করুক তোমায় শ্রীমতী ১৬। তেমনি ষাটের কবিতাতেও দুঃখ এসেছে জীবনের পরিপূর্ণ আধাররূপে শিল্পের দহন শক্তি হিসেবে কখনো তা নৈরাশ্য আক্রান্ত ক্লীবত্বকে ধারণ করে। যেমন,

১.
আমার শরীর খোড়ো দুঃখময় আত্মার গাথুনি, দ্যাখো আমি ঠিকই
খণ্ডিত ইটের মতো খুলে যাবো সহজেই, কিছুই থাকবো না
(আবুল হাসান, ভিতর বাহির, যে তুমি হরণ করো)

২.
বিলাপে মুখর হও, নতজানু, দুঃখিত, নতুবা
গ্রেনেডের মতো ক্রোধে ফেটে পড়ে ধসাবো প্রাসাদ।
(রফিক আজাদ, নৈরাশ্যবাদীর উক্তি)

রাত্রি একটি প্রধান অনুষঙ্গ ষাটের কবিতায়। রাতনামে তাদের শব্দে, বর্ণনে কখনো কবিরা রাতের রহস্যময়তায় গণিকার অপসৃত ছায়ার চকিত দর্শক, কখ

কখনো উদ্যানে ল্যাম্পপোস্টের নিচে ঠান্ডা ও জড়, কখনোবা নিঃসঙ্গ রাস্তার পিচে একরৈখিক জীবন দ্রষ্টা। সম্ভবত অস্তিত্বের প্রবল এষণাজাত তাগিদেই তাঁরা আচ্ছাচিত হন রাতের কালিমায়। অবরুদ্ধ সময়তিমিরে পাপের পঙ্কিলতায় তাঁদের চলে সময়ক্ষেপণ। আর তাই রাত, রাত্রি অনুষঙ্গ ষাটের কবিতায় একটি পনুরাবৃত্ত পরিচর্যা-উপাদান। কয়েকটি দৃষ্টান্ত-

১.

শহরের ভেতরে কোথাও হে রুগ্ন গোলাপ দল
শীতল, কালো, ময়লা সৌরভের প্রিয়তমা,
অস্পৃশ্য বাগানের ভাঙ্গাচোরা অনিদ্র চোখের অপ্সরা
দিক ভ্রান্তের ঝলক তোমরা, নিশীথসূর্য আমার!
(শহীদ কাদরী, আলোকিত গনিকাবৃন্দ, উত্তরাধিকার)

২.

এই রাত্রিরা বেথেলহামকে ব্রথেলে পরিণত করে
(আবদুল মান্নান সৈয়দ, পাগল এই রাত্রিরা, জন্মান্ধ কবিতা গুচ্ছ)

৩.

ঐ যে ছায়ার মতো একটি পুরুষ মধ্যরাতে কাকভোরে কবরের
পাশ দিয়ে প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে গ্রীন লেনে ফেরে তাকে চোনো?
(নির্মলেন্দু গুণ, নৈশপ্রতিকৃতি, না প্রেমিক না বিপ্লবী)

উপর্যুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে রাত কবিদের পঙ্কিল ও ক্লেদাক্ত জীবনের সঙ্গে একীভূত। বোদলেয়ারীয় বিকৃতি, গ্লানি ও ক্লেদে নিমজ্জিত করি গণিকাবৃন্দকে দেখেন রুগ্ন গোলাপের মত বিশুষ্ক সৌন্দর্যে। এর মধ্যে গণিকার 'ময়লা সৌরভ', কবিকে দেখাচ্ছে বিশুদ্ধ আত্মার আলো। পঙ্কিলের তিমিরে কবি দেখা পান গণিকারূপী নিশীথসূর্যের। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বেথেলহামকে ব্রথেলে রূপান্তরিত করে উন্মাদ রাত্রিরা। সবশেষ দৃষ্টান্তে ভবঘুরে বোহেমীয় কবি মধ্যরাতে মৃত্যুকে পর্যবেক্ষণ করেন। কারণ রাতের আঁধার ও কবর' অর্থাৎ নৈঃশব্দ্য অন্ধকারে কবি জীবন্মৃত সমাজ সত্তাকেই তুলে ধরেন।

জীবনযাত্রার নিরবলম্বতায়, উন্মূল মানসিক পরিস্থিতিতে বোহেমীয় জীবনাচরণে যে উচ্চারণ ও সংক্ষোভ ষাটীয় কবিদের আপাতভাবে অসহিষ্ণু করে তোলে, প্রচন্ড বিশ্বাসে করে সন্দিগ্ধ ও বিপ্লবী, ঠিক একই প্রেক্ষাপটে এর বিপরীত উৎসপ্রবাহও বিদ্যমান। ঔপনিবেশিক আইয়ুবী 'কালোদশকে'র অবদমন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সাংগ্রামিক চারিত্র্যের বিপরীতে আত্মকুণ্ডলায়িত শিল্প সত্তার

গুহায়িত পরিবর্ধনও দৃষ্টিগ্রাহ্য। বিশেষত সঠিক অবস্থানিক দোদুল্যমানতায় শিল্পশুদ্ধির নামে কেউ কেউ হয়েছেন, আত্মমগ্ন, আত্মউদরাবর্ত দ্রষ্টা। Art for Arts sake এর অযুহাতে প্রছন্ন কৌশলে সমাজ ও সামাজিকের দায়বদ্ধতা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছেন কেউ কেউ। ...."একটি প্রবণতা লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে ষাটের কবিদের রচনায় সেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ কবিতার ধারা। অলোক সরকার যে অর্থে বিশুদ্ধতার অনুসারী ছিলেন সেই অর্থে অবশ্য নয়; সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে অস্বীকার করে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাই হচ্ছে এই বিশুদ্ধতার প্রধান লক্ষণ।"[১৭] আর এ সূত্রেই পরাবাস্তবের চর্চায় নিয়োজিত হয়ে এ মতবাদটি রূপ দেয়ার চেষ্টা চলেছে বাংলা কবিতায়। তিরিশের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ পরাবাস্তবের সার্থক প্রয়োগ করেছেন। ষাটের কবিতায় আবদুল মান্নান সৈয়দ এ ধারার প্রধান রূপকার। তবে কবিতার প্রাকরণিক অনুষঙ্গ হিসেবে শহীদ কাদরীর কবিতায় এর ব্যবহার উল্লেখ্যযোগ্যভাবে লক্ষণীয়। পরাবাস্তববাদ (Surrealism) মূলত একটি শিল্প আন্দোলন। এর বিকাশ চিত্রকলাকে কেন্দ্র করে ঘটলেও এর বিস্তারণ লক্ষ করা যায় সাহিত্যসহ নানা সুকুমার কলাবৃত্তিতে। ফরাসি আঁর্দ্রে ব্রেতোঁ এর প্রবর্তক ও প্রচারক। ১৯২৫ সালে তিনি 'Manifesto' on Surrealism' প্রকাশ করে পরাবাস্তববাদকে তুলে ধরেন। পরাবাস্তববাদীরা শিল্প-সাহিত্যে কোন নৈয়ায়িক শৃঙ্খলতাকে স্বীকার করেন না। ভগ্নক্রম চৈতন্যের অবচেতন অংশের রূপায়ণে তাঁরা উচ্ছৃঙ্খল ও স্বপ্নময় প্রকাশকেই আরাধ্য বলে গণ্য করেন, "The expressed aim was a revolt against all restrains on free creativity, included among the restraints to be violated were logical reason, Standard morality, social and artistic conventions and norms and any control over the artistic process by fore thought and intention."[১৮] এলিয়টের ফোর কোয়ার্টেটস এর নৈসর্গিক বর্ণনায় মনোজাগতিক স্বপ্নকল্পনার বিস্তারণ লক্ষযোগ্য। এই পরাবাস্তব আন্দোলন দীর্ঘমেয়াদী না হলেও এর প্রভাব আধুনিক শিল্পসাহিত্যে ব্যাপক।[১৯] ষাটের কবিতায় বই পরাবাস্তব চেতনার বিস্তার লক্ষ করা যায়। আবদুল মান্নান সৈয়দ ও শহীদ কাদরীর কবিতাতেই এ ধরনের দৃষ্টান্ত প্রচুর। যেমন,

১.

আস্তাবলে বাঁধা তিনটি স্তনের এক মাতাল রূপসী এমন এক ঘোড়া মানুষের জন্ম দিচ্ছে, যে সন্তান দুপুরবেলা অলৌকিক অন্ধকারে বসে সেলাই করবে গভীরতর দরোজা, মাতৃহননের।

(আবদুল মান্নান সৈয়দ, পাগল এই রাত্রিরা, জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ)

২.

রৌদ্র, ঝরনা, নগ্ননারী

রৌদ্র : শাদা ঘোড়ার মতন

ঝরনা স্পটেড ডিয়ার

নগ্ননারী : নগ্ননারী নিজেরি সে অলঙ্কার

(ঐ, নারী, পরাবাস্তব কবিতা)

৩.

যেন স্রোতস্বিনী নদী বয়ে গেল আমার বিহ্বলতার ওপর

যেন সোনালি বালির তীরে দুটো নক্ষত্র নিয়ে ঠেকে গেল

নৌকো একজোড়া

(শহীদ কাদরী, অবিচ্ছিন্ন উৎস, উত্তরাধিকার)

ঈশ্বর, কাল ও মৃত্যুচেতনা পরস্পরিত হয়ে আছে ষাটের কবিতায়। যুগমানসের মধ্যে ঈশ্বর কবিদের ব্যক্তিগত দর্শনের সঙ্গেই একীভূত। ঈশ্বর কোন অলৌকিক সারধর্ম (essence) নয়, বরং বোদলেয়ারবাহিত চেতনায় ঈশ্বর পরাভূত, শয়তানের সঙ্গে দ্বন্দ্বরত। ব্যক্তি অস্তিত্বের বিপন্নতায় ঈশ্বর বলে কিছু নেই, বরং শয়তানই প্রজ্ঞাবান ঈশ্বর। ঈশ্বরভাবনাও ক্রমরূপান্তরিত সময়ভাবনায়–

প্রভু তোমার আশীর্বাদের হাত থেকে

রক্ষা করো আমাকে

রক্ষা করো কালো বাদামি আর হলুদ শয়তানগুলোকে

(আজীজুল হক, শয়তান, ঝিনুক মুহূর্ত সূর্যকে)

আর অপসৃত সময় বন্ধ্যাত্বের ভারি পারদে মনে হয়–

সোনালি কাঁকড়ার তীক্ষ্ণ দাঁড়া ঘিরে বইছে সময়

অনুপলে তাকে মাপা মানুষের সাধ্যের অতীত

(রফিক আজাদ, সোনালি কাঁকড়ার দাঁড়া :২)

কিংবা

পারদের মতো ভারী কিন্তু খুবই অস্থির এক

সময়ের জলে

চুম্বনে ও আলিঙ্গনে আমাদের পবিত্র শরীর ভেসে যায়...

(রফিক আজাদ, ঘড়ির কাঁটার মতো চুনিয়া আমার অর্কেডিয়া)

এই অসহ্য ভারবাহী সময় মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ষাটের দশকে মৃত্যু পেয়েছে বিপ্রতীপ চারিত্র্য। মৃত্যু একই সঙ্গে এখানে ধ্বংস ও উজ্জীবনের প্রতীক। জীবন্ত, সজীবতাকামী মানুষের অচরিতার্থতাগত মীমাংসার বীজ স্বরূপ মৃত্যু থেকেছে ক্রিয়াশীল। কখনো কখনো মৃত্যু শিল্পের সমতুল্য হয়ে উঠেছে কবির চেতনায়। আবুল হাসানের 'একটি সংগমরত বৃশ্চিকের মৃত্যু দেখে'ও মোরগ' (পৃথক পালঙ্ক) কবিতাদ্বয়ে মৃত্যুর মধ্যে কবি শিল্পের যন্ত্রণাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যেমন,

জানলো না ঘাসের ভিতর একটি যৌন আলিঙ্গন
এমন গোপন শিল্পে মৃত্তিকার মুছিল শরীর!
(আবুল হাসান, একটি সংগমরত বৃশ্চিকের মৃত্যু দেখে, পৃথক পালঙ্ক)

গ. প্রকরণ কবিচৈতন্যের অন্তর্গত জটিল চিন্তনের মধ্যে অনুপ্রবেশের কবিকর্তৃক সংরক্ষিত সংগোপন দরোজা। একটি বিশেষ আবহকে প্রাকরণিক বিন্যাসে কবি প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্যে ব্যঞ্জিত করেন। এ বিষয়ে মালার্মেস্থিত সুধীন্দ্রনাথের অভিমত, 'আমার কাব্য জিজ্ঞাসায় আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য'[২০] আর এই আধাব ভাষা, শব্দ উপমা, প্রতীক, রূপক চিত্রকল্প ও ছন্দের সুষমাতেই পূর্ণতা পায়। কারণ "রূপ আর প্রসঙ্গের পরিপূর্ণ সঙ্গমেই কাব্যের জন্ম"[২১] কোলরিজ ভাষার সাংগঠনিক পদ্ধতিকে তিনটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছেন, Every man's language has, first, its individualities, secondly, the common properties of the class to which he belongs: and thirdly, words and phrases of universal use[২২] আর এই ভাষা সৃষ্টি হয়ে থাকে শব্দ সমূহের যথার্থ ব্যবহারে। বিশেষত কবিতার ভাষা নির্মাণে শব্দের ব্যবহার স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়ে থাকে। ষাটের কবিতার প্রাকরণিক কৌশল বাংলা কবিতায় অনেকটা অভিনব, কবিদের স্বতন্ত্র শিল্প অনুধ্যানের পরিচায়ক। ষাটের কবিতার প্রকরণ এসেছে কবিতার বিষয় থেকে আবার কখনো বিষয়ী থেকেও। মূলত উপমা, শব্দচয়ন অলঙ্কার সন্নিবেশে ষাটের কবিরা প্রথাবিরোধী। কবিতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সত্তায় পৌঁছে দিতে এঁরা সচেষ্ট।

চিত্রকল্প (Image) সৃজনে সবচে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে কবির বিশেষ কল্পনাশক্তি। আর এটি নির্ভর করে কবির অনুভববেদ্যতার সাংগঠনিক ঐক্যের উপর। হেনরী জেমসের (Henry James) মতে এটি হলো 'Very atmosphere of his mind' কিংবা পেটার (Pater) একে 'Liturgical monotone' বা 'গণপ্রার্থনা সংক্রান্ত একটানা সুর' বলে অভিহিত করেছেন। কার্মোড (Frank kermode) একে বলেছেন "reward of agonising

difference"[২৩] "সুতরাং কাব্যে ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা যে কল্পনাশ্রয়ী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সূচিত হয়ে রূপবর্ণ শব্দগন্ধস্পর্শ ও স্বাদ প্রভৃতি নানা সংবেদনের একটির বা একাধিকের স্মৃতি বহন করে এবং উদবোধ ঘটায় সেই বস্তু চিত্রকল্প।"[২৪] সুতরাং চিত্রকল্প হচ্ছে কল্পনা শক্তির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্বহের অনাস্বাদিত উদবোধন। আর এক্ষেত্রে কবি বা শিল্পিমানসের নৈঃসঙ্গ্যজনিত অনুভববেদ্যতাই সক্রিয়। ষাটের কবিরা চিত্রকল্প সৃজনে তাঁদের অভিজ্ঞতালোকের যুগমানসকে বিধৃত করেছেন। নাগরিক অবক্ষয়, ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষায় লিবিডোর অন্তর্চাপ, সমাজ মানসের সঙ ঘবিচ্ছিন্ন অভিযোজনঅক্ষম ব্যক্তিকতা তাঁদের চিত্রকল্প সমূহে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

১.

সম্ভবত তিনদিনের বৃষ্টি
তার স্বপ্নের দেয়ালে হলদে স্যাঁতসেতে চিত্র রেখেছে
(শহীদ কাদরী, ভরা বর্ষায় : একজল লোক উত্তরাধিকার)

২.

তোমার ক্লেদ সহসা ইন্দ্রধনু হল
আর আমি কাঁকড়ার মত
অনুর্বর উল্লাসে ভোজে মত্ত,
(ঐ, পরস্পরের দিকে, উত্তরাধিকার)

৩.

শিশিরে ও ঘাসে ঘেরা বাড়ি
খুলে যায় হাওয়া বাদলে
শালিকের মতো ঠোঁটে
বলে কেউ নেই
(রফিক আজাদ, শিশিরে ও ঘাসে ঘেরা বাড়ি, পরিকীর্ণ পানশালা আমার স্বদেশ)

৪.

তিনটি রমণী কাঁখে নিয়ে ত্রিকালের জলের কলস
হেসে হেসে বাড়ি ফিরছে বাড়ি
(আবুল হাসান, ভুবন ডাঙায় যাবো, যে তুমি হরণ করো)

উপর্যুক্ত প্রথম দৃষ্টান্তে বৃষ্টির অবিরাম ধারায় স্বপ্নের দেয়ালে যে স্যাঁতসেতে চিত্র জমে তার মধ্যে হৃদয়-বৈকল্যের অনুভূতিসহ দৃশ্যাত্মক চিত্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ক্লেদের ইন্দ্রধনুর মাত্রাপ্রাপ্তিতে তা যেমন অনিবার্য পৌরাণিক চিত্রকল্পের মাত্রা পাচ্ছে তেমনি নিঃসঙ্গ কর্কটের অন্তর্গত আত্মকেন্দ্রিকতাও সম্প্রকাশিত। তৃতীয় দৃষ্টান্তে হাওয়া-বাদলের আর্দ্রতায় শালিকের মতো ঠোঁটে ম্লান নৈঃসঙ্গ্যের চিত্রকল্প ব্যঞ্জিত হয়েছে। সবশেষে রমণীত্রিত্বের বাড়ি ফেরা চিত্রকল্পাত্মক বর্ণনায় আমাদের গ্রামীণ অভিজ্ঞতালোককে স্পর্শ করে। ইন্দ্রিয়জ রূপরসগন্ধস্পর্শময় চিত্রকল্পে ষাটের কবিরা নাগরিক ক্লেদ, গুহায়িত উন্মূল জীবন প্রবৃত্তির প্রবল অভিঘাত, অস্তিত্বের প্রগাঢ় সংরাগ ও অতলান্তিক মনোবেদনাকে ধারণ করেছেন। ফলত চিত্রকল্পসমূহ হয়ে উঠেছে কবিদের ব্যক্তিচৈতন্যের নিগূঢ় প্রতিভাস। রূপব্যঞ্জনাময়, বহুবর্ণিল বিচ্ছুরিত ও ধ্বনিসুষমিত চিত্রকল্প সমূহের বিন্যাসে বর্জিত হয়েছে প্রচল শব্দবিন্যাস, উপমা-উপমান কৌশল। ইন্দ্রিয়জ চিত্রকল্পের কতিপয় দৃষ্টান্ত-

দর্শনেন্দ্রিয়ের চিত্রকল্প :
কাঠবেড়ালও নই যে কর্মঠ গতিতে তরতর উঠে যাবো
যে-কোন গাছের দোতলায় কিম্বা
ডোরা-কাটা সাপের মতন প্রাকৃতির আহার ফুরালে
আচমনহীন পালাবো গর্তের ঠান্ডা কামরাতে
(শহীদ কাদরী, নিসর্গের নুন)

শ্রুতি চিত্রকল্প-
সমস্ত শরীরময় বেজে ওঠে সুখের সঙ্গীত
ধমনীতে উদ্দাম নৃত্যের শব্দ শুনি
(রফিক আজাদ, তোমাকে কাছে পেয়ে, একজীবনে)

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের চিত্রকল্প-
আমরাই বিকৃত তবে? শান্ত, শুদ্ধ এই পরিবেশে
আতর লোবান আর আগরবাতির অতিমর্ত্য গন্ধময়
দেবতার স্পর্শ-পাওয়া পবিত্র গ্রন্থের উচ্চারণে
(শহীদ কাদরী, নপুংসক সন্তের উক্তি

স্পর্শ–

আমার স্পর্শের যাদু না পেলে
তোমার স্তনের লাবণ্য ঝুলে পড়বে নাভির নিকট
অন্য পুরুষের ছোঁয়া লেগে
সুন্দর মসৃণ উরু হয়ে যাবে সরু
(রফিক আজাদ, বৃক্ষেব যেমন অবস্থা, চু, আ. অ.)

স্বাদ

লেবুর কুঞ্জের শস্যে সংগৃহীত লেবুর আত্মার জিভে জিভ রেখে
শিশু যে আস্বাদ আর নারী যে গভীর স্বাদ
সংগোপন শিহরনে পায় আমি তাই।
(আবুল হাসান, নচিকেতা, পৃথক পালঙ্ক)

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্ত গুলোতে দৃষ্টি শ্রুতি, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়শাসিত চিত্রকল্প ব্যঞ্জিত হয়েছে। প্রথম দৃষ্টান্তে 'কাঠবিড়ালী'র দ্রুত গতিমুখরতার সঙ্গে কবির শ্লথগতি ও চেতনার দ্বৈরথ দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে কবির শরীরী ঝংকার শব্দ ও ধ্বনিব্যঞ্জনার সম্প্রকাশিত। তৃতীয় দৃষ্টান্তে আতর লোবানের ও আগরবাতির গন্ধে পাপ ও পুণ্যের, পবিত্র-অপবিত্রবোধ এমনকি নিস্তরঙ্গ মৃত্যু চেতনাও প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত। চতুর্থ দৃষ্টান্তটি স্পর্শ চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনাময় দৃষ্টান্ত। কবির স্পর্শহীনতায় কবিপ্রেয়সীর স্তনের লাবণ্যের [illegible] নিশ্চেষ্ট হয়ে ঝুলে পড়বে নাভিমূলে অর্থাৎ সেই পীনোন্নত স্তনের দৃঢ়রেখ যেন কবির স্পর্শের আকাঙক্ষায় উন্মুখ স্পর্শকাতর। শেষ দৃষ্টান্তে লেবুর আত্মার জিভে জিভ রেখে শিশু ও নারীর আস্বাদ যেমন স্বাদ রসের ব্যঞ্জনা আনে তেমনি তার প্রতিক্রিয়াজাত সংগোপন শিহরন একই সঙ্গে স্পর্শের শিহরন জাগায়।

ষাটের কবিতার একটি উজ্জ্বল অনুষঙ্গ 'অন্ধকার'। জীবনের প্রগাঢ় ঔজ্জ্বল্যের প্রয়োজনে অন্ধকারে আচ্ছাদিত পাপ-সন্তানেরা যেন অপসৃত আলোকেই অনুসন্ধান করেন। অন্ধকার এসেছে নগরের তমসাচ্ছন্ন একঘেয়ে জীবনের প্রতীকে, কখনো সৃষ্টিহীন বন্ধ্যাত্ব, রতিক্লান্ত প্রেমের বিষাদ ও বিষণ্ণতায়। বস্তুত অন্ধকারেই এ-দশকের কবিদের মানস-স্বাতন্ত্র্য সম্প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দেশজ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও অনেকাংশে দায়ী। আইয়ুবী কালো দশকের প্রগাঢ় তমসায় কবিরা অস্তিত্বের রশ্মি খুঁজেছেন। অন্ধকার কখনো পঙ্কিল জীবনেরও প্রতিরূপক, বৈরী

সময়ের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিহীন কবির তৃতীয় চক্ষুর উন্মীলন ঘটে না বলেই সম্ভবত তাঁরা জীবনকে সদর্থক আলোয় প্রোজ্জ্বলরূপে দেখেন না। অন্ধকারের চিত্রকল্প সৃজনে এ কারণেই অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষাটাই অধিক বলে বিবেচ্য হয়–

১.

তিনজন অন্ধ বুড়ো জোৎস্নাভরা মাঠে কী কৌতুকে
গালগল্প পাড়ে
গান ধরে অন্ধকার গলি 'হে প্রেম হে আমার প্রেম'।
(শহীদ কাদরী, আমি কিছুই কিনবো না)

২.

অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার, চতুর্দিকে আঁধার, আঁধার-
আমার মুক্তির কোনো আশা নেই, সম্ভাবনা নেই।
(রফিক আজাদ, অকর্মক ক্রিয়ার উক্তি)

৩.

পালাবো পালাবো বলে যতবার গাঢ় অন্ধকার
শরীরে জড়িয়ে নিই,
(আজীজুল হক, জনপদে অশ্বারোহী, ঘুম ও সোনালি ঈগল)

প্রথম দৃষ্টান্তে অফুরন্ত জ্যোৎস্নার প্রফুল্ল মাঠের নৈঃসঙ্গ্যে তিনজন অন্ধ বুড়ো'র গল্পগুজবের মধ্যে আলোকিত সময়ে নিরস্তিত্বচেতনায় অথবা চৈতন্যের অন্ধত্বে ব্যর্থ দিবালোকের চিত্র মূর্ত করে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ জ্যোৎস্নার প্রোজ্জ্বল আলো, বর্ণোৎসব তিনজন অন্ধের কাছে নিরর্থক, অন্ধকারতুল্য, সম্ভাবনাহীন। কারণ তারা তিনজনই বিগত যৌবন। অন্ধকার গলির গানও তাই ক্যারিকেচারে পর্যবসিত– 'হে প্রেম, হে আমার প্রেম'। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বন্ধ্যা ও সম্ভাবনাহীন সময়কে অন্ধকারের মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে কবি স্পষ্টত অস্তিত্ববাদী দর্শনের স্বীকার। শুদ্ধসত্তায় উত্তীর্ণ না হয়ে অর্থাৎ আলোর দিকে ধাবমান না হয়ে কবি অন্ধকারে সঞ্চরণ করেই আলোর প্রত্যাশী। আর সেই কারণেই সূর্যালোকিত দিবস অথবা সূর্যবন্দনার চিত্রকল্পও যাটের কবিরা করেছেন–

১.

একটি বলদ চুপ সূর্য টেনে চলে তার
কাঁধের জ্বলজ্বলে ক্ষতে
(আবদুল মান্নান সৈয়দ)

২.

মেঘমুখী ফুল তুমি সূর্যমুখী হও
সূর্যই আমাদের প্রথম নায়ক
চিরকাল আমাদের নায়কই সে আছে।
(আজীজুল হক, মেঘমুখী সূর্যমুখী)

ইম্প্রেশনিস্টিক চিত্রকল্প কবিচৈতন্যের গহন অঞ্চলের সংবেদনশীল সম্প্রকাশ। বহির্জাগতিক দ্বান্দ্বিক অভিঘাতে অন্তর্জগতের সঙ্কোচন এবং প্রতিক্রিয়াতেই ইম্প্রেশনিজমের সূচনা। সুতরাং এ মতবাদে শিল্পীর মনোচৈতন্যের স্ফুরণ প্রাধান্য পেল, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিশেষ আবহ (atmosphere) গুরুত্ব পেল প্রকাশভঙ্গিতে। বাস্তবের হুবহু অনুকৃতি নয় বরং প্রাণময় সত্তার স্পন্দিত, অনুরণিত পুষ্পিত প্রকাশই এ ধারার প্রধান প্রবণতা।

'অর্থাৎ জাগতিক বস্তুকে এক অতিজাগতিক অনুভূতির বলয়ে উত্তীর্ণ করে দেওয়াই এর অভিপ্রায় এবং এ উত্তরণে গভীরতর অন্তর্জীবনের স্পন্দনই সদাসঞ্চরণশীল এক সত্তায় পর্যবসিত হয়। এটাকে বলা চলে আত্মগত দৃষ্টি শক্তির স্বয়ম্ভর প্রকাশ'[২৫] ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকল্পে কোমল, মৃদু, সঞ্চরণশীল ও গতিমান সময়বিন্যাসকে দেখানো হয়ে থাকে। কবির মনোজাগতিক রূপান্তর, অভ্যন্তর প্রতিক্রিয়া বিবৃত হয় আলোর প্রতিসাম্যে–

যেমন,

১.

যে রুটিতে ঝরে না ঝর্ণার মতো, মেশে না তোমার
স্তনের লবণ আমি তাকে কোথাও দেখি না
খুঁজি না কখনো। তোমার বিহ্বল হৃদ ছাড়া
আর কোনো স্নানও জানি না-
(শহীদ কাদরী, একবার শানোনো ছুরির মতো

২.

সোনালি লাল বিশাল বল এর মতো
ভোরবেলার সূর্য লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে
(আবদুল মান্নান সৈয়দ)

এখানে প্রথম দৃষ্টান্তে ঝর্ণার উৎসধারার মধ্যে রমণীর স্তনের পেলবতা সৃষ্টি করে চিত্র বৈষম্য; আবার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ভোরবেলার সূর্যের বিক্ষিপ্ত ও উল্লম্ফনধর্মী বিচ্ছুরণে আলোর বিক্ষিপ্ততাকে প্রকাশ করা হয়েছে। ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকল্পের সঙ্গে প্রতীকী চিত্রকল্পের সংমিশ্রণে ষাটের কবিতায় এক নিবিড় প্রতিসাম্য রচিত হয়েছে। কখনো কখনো এ বর্ণনা পরাবাস্তব আবহধর্মী হয়ে কবির মনোচৈতন্যের বিবিধ অনুভূতির স্মারক হয়ে ওঠে। আগুন, বৃষ্টি, নর্তকী, মাছ প্রভৃতির এক ঘনীভূত আবেদন কবিতাকে করে তোলে রূপ ব্যঞ্জনাময়, কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যের প্রতিরূপক। বৃষ্টি, আগুন, মাছ, ষাটের কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে পরাবাস্তব চিত্রকল্পের অনুষঙ্গে। শহীদ কাদরী, আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখের কবিতায় 'মাছ' কবিচেতনার বিচিত্র ভাবের বাহক।

যেমন,

১.

দেখলাম একটা শাদা চকচকে মাছ
প্রাচীন মসজিদের মতো বয়োবৃদ্ধের
বড়শীতে গাঁথা পদ্মপুকুরে
ঘর-ফেরা সন্ধ্যায়

(শহীদ কাদরী, আইসম্যান আমার ইমাম)

২.

এসেছি সোনার টুকরোর মতো চকচকে মাছ তোমার রূপালি স্রোতে

(আবদুল মান্নান সৈয়দ, শহরে অচেনা মাছ, ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ)

শহীদ কাদরীর কবিতাংশে 'মাছে'র বয়োবৃদ্ধের বড়শিতে আটকে যাওয়া কবির সমর্পিত আত্মার ভ্রান্তিময় কালক্ষেপণ বিবৃত হয়েছে। নতুন মূল্যবোধের উজ্জ্বল চক্ষুষ্মান এই মাছ প্রাচীনের অর্থাৎ অনগ্রসর চৈতন্যের টোপ গিলে বর্তমানে আত্মমগ্ন। এ-চিত্রকল্পটি পরাবাস্তব চেতনাবাহী। কিন্তু 'ঘর ফেরা সান্ধ্যকালীন ধূসর ধুম্রতার আলোর বিহ্বল প্রচ্ছায়ার উল্লেখে ইম্প্রেশনিস্ট মাত্রাও এর সঙ্গে সংযোজিত হয়। আর 'চকচকে মাছ' হয়ে উঠেছে কবির অনভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্যের স্মারক। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'সোনার টুকরোর মতো চকচকে মাছে'র আবির্ভাব কবির নিরন্তিত্ব চৈতন্যের বাহক। এ নাগরিক জীবনে অচেনা মাছের প্রতীকে কবি ভেসে আসেন প্রাত্যহিকীর রূপালি স্রোতে। কিন্তু তার এই আগমন বর্ণহীন নয়, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও স্বাতন্ত্র্যসূচক কবি চেতনা বিবৃত হয় সোনালি চকচকে রঙের উল্লেখে। এখন কতিপয় প্রতীকী চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত

বৃষ্টি ও আগুন

১.

আগুন বৃষ্টি বিদ্যুৎ ঝড়-আর
সভ্যতার কাছ থেকে একটি ছুরি

... ...

অগ্নিময় বৃষ্টিতে তুমি ঠাণ্ডা, হিম, সোনালি ছুরি প্রয়তমা
(শহীদ কাদরী, এইসব অক্ষর)

২.

লম্বা লম্বা সরু বৃষ্টির আঙুল লোকটাকে হাতড়ে দেখছে
তার জ্বলজ্বলে জামা শপশপে ভেজা
(ঐ, ভরা বর্ষায় : একজন লোক)

৩.

আগুন! আগুন!
সামনে পুড়ছে সব পদ্মফুল, বেশ্যালয়, খোলা মদ্যশালা।
(আবুল হাসান)

৪.

তখোন সমস্ত শরীর হয়ে যায় একটি বিশাল রুটি অগ্নি ঝলমলে)
(ঐ)

নৃত্য ও নর্তকী-

১.

সব স্মৃতি-বিস্মৃতি, নৈঃসঙ্গ্য -নির্বেদ
ছন্দিত ঘূর্ণির রেখায় নিথর ঘাঘরার মত
যুগপৎ নৃত্যরত এবং সুস্থির।
(শহীদ কাদরী-নর্তকী)

২.

এই মাত্র যন্ত্রণার নাচ তার সিদ্ধ হলো, শিল্পীভূত হলো
খুনের ঝোরায় তার নৃত্য ভেসে নর্তকের নিদ্রা ফিরে পায়।
(আবুল হাসান, মোরগ, পৃথক পালঙ্ক)

৩.

আমার ডাকেই আমি নিয়ত জাগিয়ে তুলি দেহ
ব্যালে-নৃত্যে নিপুণ মুদ্রায়;
(রফিক আজাদ, নিজিনস্কি, অসম্ভবের পায়ে)

উদ্ধৃতাংশগুলোতে অগ্নি ও বৃষ্টির ব্যবহার যুগপৎ ধ্বংস ও সম্ভাবনার। -অগ্নি প্রায়শই কবি অস্তিত্বের সংহারক অনুষঙ্গরূপে প্রতীকায়িত। প্রবৃত্তির অন্তর্দহন, সৃষ্টিশীল আত্মার জ্বালা (যা অনেকটা রোমান্টিকদের সমতুল্য) অস্তিত্বের বিপন্নতা ও বিরুদ্ধে পরিবেশ অগ্নির ব্যবহারকে করেছে বৈশিষ্ট্যময়। সৃষ্টিসম্ভাবনাহীনতাও অগ্নির দাহিকাশক্তির মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। আর বৃষ্টি ব্যবহৃত হয়েছে ফলবত্তার প্রতীকে। বৃষ্টি-প্রত্যাশী কবি অন্তরের প্রজ্বলিত অগ্নি-নির্বাপণে বৃষ্টিকেই আরাধ্য করে তোলেন। নর্তকী, নৃত্য অনুষঙ্গ প্রেমের প্রজ্বলন, প্রহেলিকা, প্রবঞ্চনার সঙ্গে কিংবা দেহজ প্রবৃত্তির উন্মাতাল বাসনার মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। কখনো কখনো মৃত্যুর নৃত্যকেও দেখা হয়েছে শৈল্পিক নৃত্যমুদ্রায়। জীবনের স্ফুরণ ও সার্থকতা উচ্চারিত হয়েছে এভাবে-'নেচেছি একটি বার জীবনের ঘাসের উপর' (আবদুল মান্নান সৈয়দ)

শহরের চিত্রকল্প এলিয়ট এঁকেছেন বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঊষর মরুভূমিতে, অন্ধ গলি, কানা বেড়াল ও স্যাঁতসেঁতে বিরূপ পরিবেশে। বোদলেয়ারের প্যারিস নগরীর বিবমিষা তার জীবনক্লান্তিতে যুক্ত করেছে বিষাদ, নির্বেদ, মৈথুনক্লান্ত বিষণ্নতা। ষাটের কবিতায় এ শহরের চিত্রকল্পও অনুরূপ গতানুগতিক স্পর্শে চিত্রিত-

সোনলি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগরে দিলো যেন
দীপহীন ল্যাম্প পোস্টের নিচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সবকিছু,
(শহীদ কাদরী, উত্তরাধিকার, উত্তরাধিকার)

আর নিসর্গও তারই অনুষঙ্গ ধরে অনেকটা জীবনানন্দীয় ধূসরতায়[২৬]-

দেখেছি প্রখ্যাত ক্ষেত -নষ্টফল-নক্ষত্রের মতো
দ্রা. ইক্ষু, গম, সর্ষে আর জ্যোৎস্না আর ফাঁকা তাবু
(ঐ, নিরুদ্দেশ যাত্রা)

ষাটের কবিতার উপমালোকও কবিদের চৈতন্যধৃত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের স্মারক। সময়ের দ্বান্দ্বিকতা, আত্মপ্রকাশের অভিনতুন দিগন্ত সন্ধানের প্রেরণায়, অন্ধকার, পঙ্কিল জীবনের নৈঃসঙ্গ্যচেতনায়, কালের অর্থাৎ যুগমানসের প্রৌঢ়ত্বে, অস্তিত্ব-সন্ধানী ক্ষতার্ত সমকালের রূপব্যঞ্জনায় তাঁদের উপমাগুলো পেয়েছে বৈশিষ্ট্যসূচক মাত্রা। কখনো কখনো কবির মনোবেদনার অনুষঙ্গে অন্তর্বাস্তবতার রূপায়ণে উপমা পেয়েছে পরাবাস্তব অনুষঙ্গের মাত্রা। উপনিবেশশৃঙ্খলিত অস্থির দৈশিক প্রেক্ষাপটে, বারুদ, উত্তাপময় গ্রেনেডে স্টেনগানের সাহচর্যে উপমাও হয়ে উঠেছে সাংগ্রামিক চারিত্র্যমণ্ডিত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত

১.

শর্করার মতো রাশি রাশি নক্ষত্র বিন্দুর স্বাদে
রুচি নাই।

(শহীদ কাদরী)

২.

আর আমি শুধু আঁধার নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটের রক্তাক্ত জবার মতো

(ঐ)

৩.

নেমে যায় পিচ্ছিল কৃমির মত
স্বপ্নের সুড়ঙ্গ পথে

(ঐ)

৪.

গ্রেনেডের মতো ধসে পড়ে ধসাবো প্রাসাদ

(রফিক আজাদ)

৫.

সেখানেও বসে আছে বৃক্ষের মতন একা একজন লোক

(আবুল হাসান)

৬.

যেন এক প্রবীণ সমাজ
আর সব সেকালের সমাজের মত
ছাড়বে খোলস

(আজীজুল হক)

৭.

সূর্যাস্তের মতো রাঙা বেশ্যা
নীল জানালার পাটাতনে বসে আয়না ধরেছে
(আবদুল মান্নান সৈয়দ)

ষাটের কবিরা বিশেষণ ব্যবহারেও নিজস্বতার বৈশিষ্ট্য রেখেছেন। বিশেষণ কখনো কবিচিত্তের অপ্রকাশিত ভাবপুঞ্জের সহায়ক অনুষঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, কখনো সমাজসত্তার অন্তর্মূলের নিগূঢ় ব্যঞ্জনাশ্রিত, আত্মঅস্তিত্বের অনুভববেদ্যতার, সংবেদনশীলতায়, সময়, সমাজ স্বদেশ-অন্বেষার ব্যাপ্তিতে বিশেষণ ব্যবহারের প্রয়াস লক্ষণীয়। কবিতার আঙ্গিক বিবেচনায় উপমা রূপক চিত্রকল্পে বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে ভাষিক কাঠামোকে গতিশীল, সংহত ও আবেগধর্মী আবেদন সৃষ্টিতে। সুতরাং শহীদ কাদরী, রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবুল হাসান, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখের কবিতায় ব্যবহৃত বিশেষণসমূহ তাঁদের স্ব-স্ব মনোজগতের অব্যক্ত ধ্বনিপুঞ্জের ভাববাহক হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছে। কতিপয় দৃষ্টান্ত-

১. শীতার্ত নিঃস্বতায় কিছুই বাঁচে না (শহীদ কাদরী, এই শীতে)

২. বসন্তের শিথিল স্তন (ঐ)

৩. শাদা শাদা নিষ্করুণ ঠান্ডা মরা জামা (ঐ, ভরাবর্ষায় : একজন লোক)

৪. সে আমার অন্তরঙ্গ অলীক লণ্ঠন (রফিক আজাদ, স্মৃতি, চাঁদের মতো ঘড়ি)

৫. চুম্বনে আলিঙ্গনে আমাদের পবিত্র শরীর ভেসে যায় (ঐ, ঘড়ির কাঁটার মতো)

৬. অলিতে গলিতে ঝিমন্ত ফোয়ারায়, বিচ্ছুরিত আঙুর অলার গাড়ির পাশে....
(আবদুল মান্নান সৈয়দ, পাগল এই রাত্রিরা)

৭. সাবানের সুরভি ফেনা সেন্টের সুরভি শিশি
(আবুল হাসান, ভিতর বাহির)

ভাষা ও ছন্দে ষাটের কবিরা বৈচিত্র্যপ্রয়াসী। নাগরিক অনুষঙ্গবহ শব্দাশ্রিত নিরেট, নির্মেদ ভাষাভঙ্গির সঙ্গে প্রতীকোৎসারী ভাষার সমন্বয় তাঁদের কবিতাকে দিয়েছে দার্ঢিক সংহতি কাব্যিক আবেগ ও প্রবহমানতা। শহীদ কাদরীর ভাষায় নাগরিক শব্দাবলির সংমিশ্রণে কবিচিত্তের সংহত পরিণত আবেগ সৃষ্টি করেছে নৈর্ব্যক্তিক ঢং। কখনো কখনো ইংরেজি বাক-বিন্যাস, শব্দের প্রয়োগ, কবিতায় দিয়েছে নতুন মাত্রা। আবদুল মান্নান সৈয়দের ভাষা পরাবাস্তবচেতনাবাহী

স্বপ্নকুহকময় ভগ্নক্রম ব্যাকরণে গাদ্যিক ঢঙে বিন্যস্ত। আবুল হাসানের ভাষাভঙ্গিতে আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তিমূলক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রফিক আজাদও অনেকটা আত্মজৈবনিক ঢঙে প্রতীকোৎসারী ভাষাভঙ্গীর সাযুজ্য ঘটিয়েছেন। কবিতায় নির্দ্বিধায় ব্যবহৃত হয়েছে গ্রেনেড, স্টেনগান, বুলডেজার, রাইফেল, বুলেট ইত্যাদি ভারি সমরাস্ত্রের উল্লেখসহ পোস্টার, ফেস্টুন, লেফট রাইট, ল্যাম্পপোস্ট প্রভৃতির মতো ইংরেজি শব্দাবলি। ফলত ভাষাভঙ্গিতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ব্যঞ্জনা।

১.

ক্যাটার পুলার আর বুলডেজার যতোবার মানুষের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছে
(আবদুল মান্নান সৈয়দ, রাত্রি)

২.

মাথার ওপরে ক্রমাগত গর্জমান এ্যারোপ্লেন
জেটিতে নড়ছে ক্রেন, চতুর্দিকে ভাসছে রণতরী
(শহীদ কাদরী, প্রত্যহের কালো রণাঙ্গণে

এই ভাষার সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে কথ্য ভষা বা ডায়ালেক্ট। এই কথ্য ভাষার মিশ্রণই ষাটের কবিতার ভাষাকে দিয়েছে প্রাত্যহিক চরিত্র। কথ্য ভাষায় জীবনের গতি ও পেষণ প্রতিফলিত হয় অনিবার্য উপাদানরূপে[২৭]। আর ষাটের কবিতায় এ-ভাষার চর্চা হয়েছে সার্থকভাবে, কবিতাও হয়ে উঠেছে কথ্য গন্ধী, গাদ্যিক সুষমামন্ডিত–

১.

দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো হে সাঙাৎ
কী ইংরাজি জানে অই চাঁদ
(শহীদ কাদরী, চন্দ্রাহত সাঙাৎ)

২.

নীলাভ আকাশে ওড়া শাদা বগার মতন ক্রন্দন-পুরনো কোনো ঘুড়ি?
(ঐ, শেষ বংশধর)

আবার কখনো লোকজ ভাষাভঙ্গি, বিশেষ করে ছড়ার আঙ্গিকেও কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। আসাদ চৌধুরীর কবিতা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আসাদ চৌধুরী ফোকমোটিফের ব্যবহার করে তাঁর কবিতার ভাষা ও বিন্যাসে সৃষ্টি করেছেন

ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। বাউলের জীবনদর্শনও এক্ষেত্রে প্রধান প্রেরণারূপে কার্যকর থেকেছে।

পাখি শিখলো কতো ছলাকলা
সে যে চিনেছে লাল ধলা কালা
খাঁচার ভিতর সে না আমি
হায়, কে দেবে সে রোশনাই!
(আসাদ চৌধুরী, তত্ত্বজ্ঞান জলের মধ্যে লেখাজোখা)

ছন্দ ব্যবহারে প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের চর্চা এ-দশকে হলেও গদ্যছন্দের বহুল ও সার্থক ব্যবহার এ-দশকে সূচিত হয়। আবদুল মান্নান সৈয়দ, শহীদ কাদরী, নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় গদ্যছন্দের সার্থক ব্যবহার লক্ষণীয়। আবদুল মান্নান সৈয়দের গদ্যছন্দ কবিতার ভাববিন্যাসে, রূপক প্রতিরূপক রহস্যময় অঞ্চলের ব্যঞ্জনায়, পরাবাস্তব অনুষঙ্গে ও প্রবহমানতায় আশ্চর্য সিদ্ধিচূড়া স্পর্শ করেছে। যেমন,

আমি এসেছি,
কারখানা আর মরণ আর রেললাইন বসানো শহরতলির পাশ দিয়ে
এসেছি
ছোট্ট মড়রঙের প্রপেলার আতীব্র ঘুরিয়ে
এসেছি
শহরে নতুন একটা চাষার মতো
ছিলাম পৃথিবীর শেষ সুন্দরীর মাথার ভিতরে সোনালি মাছ
(শহরে অচেনা মাছ ও সংবেদন ও জলতরঙ্গ)

রঙ কবিচিত্তের কল্পনাশ্রিত সৃষ্টিশীল অনুভূতির প্রাণবান প্রকাশ। রঙের মাধ্যমেই কবি বা শিল্পী তাঁর সত্তাস্থিত প্রতিফলিত জগৎকে উন্মোচন করেন। আর যে আকৃতির অবয়বে কবি আত্ম উন্মোচনের স্বরূপ বিস্তৃত করেন রঙ বা বর্ণ তারই দর্পণাভাস। 'রঙের নিরপেক্ষ সত্তা আমাদের সংস্কার চেতনার মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে জীবনবোধে এক একটি প্রতিমান গড়ে তোলে। কবিতায় বর্ণসমাবেশ ঐসব সংস্কার-সত্তা, প্রতিমান থেকেই গৃহীত হয়, তবে বহির্প্রকৃতি বা জীবনরূপের অবস্থান থেকে রঙ রূপান্তরিত হয়ে যায় কবির চৈতন্য-সঞ্জাত সত্তা-প্রতিমায়।'[২৮] সুতরাং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও নিষ্ঠার প্রতীতিতে দৃশ্যমান জগৎ এক অপূর্ব রূপময়তা প্রাপ্ত হয় কবিকৃত রঙের প্রতিসাম্যে। আর বর্ণসম্পৃক্ত বস্তুজগতের

ত্রিমাত্রিক অস্তিত্বময় অবস্থানের রূপান্তর ঘটে, প্রাপ্ত হয় নবতর মাত্রা। ফলত বস্তু জগতের এই বস্তুধর্ম কবি চৈতন্যে পেয়ে থাকে ভাবধর্ম।[২৯]

রঙ ব্যবহারে ষাটের কবিরা বর্ণচোরা। প্রচলিত রঙকে ভেঙে চুরে বিচিত্র রঙের প্রতিসাম্য সৃষ্টির প্রয়াস কবিতায় লক্ষ করা যায়। কখনো ফ্যাকাশে ধূসর আলোছায়াময়, এক ধরনের বিবর্ণতাও শব্দচিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁরা রাত্রিচারী বলে তাঁদের রঙগুলোও আলো ছায়ার কারসাজিতে নিপুণ। রঙ ব্যবহারের বৈপরীত্যও সৃষ্টি করেছে এক ধরনের উদ্ভট, দুঃস্বপ্নময় মায়ার জগৎ। এই রঙকে যেমন ইম্প্রেশনিষ্টদের কোমলতায় ফেলা যায় না তেমনি এক্সপেশনিস্ট কিংবা ফকিস্টদের বর্ণাঢ্যতা দিয়েও নির্দিষ্ট করা চলেনা। প্রায়শঃই বস্তুর রঙ বস্তুতে বিলীন, প্রিজম-সদৃশ বহুবর্ণিল বিস্তারে খন্ড-বিখন্ড।

যেমন,

এই রাত্রিরা সেই লাল আলোর ভালো যা তোমাকে প্রশস্ত
স্ট্রিট থেকে নিয়ে যাবে কঙ্কালের সরু সরু পথে, অনাব্য
স্ত্রীর মতো কেবলি অন্যদিকে।

(আবদুল মান্নান সৈয়দ, পাগল এই রাত্রিরা)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত হয়েছে 'লাল রঙ' যার প্রেক্ষাপট বর্ণ চোরা ও রহস্যময়। উজ্বল রক্তবর্ণের মধ্যে যে বর্ণাঢ্যতা ও অতিরেক সম্প্রকাশিত তা এখানে অনুপস্থিত। কারণ এই 'লাল আলোর ভালো' যা প্রশস্ত স্ট্রিট থেকে একটি অশুভ কঙ্কালের পথে অর্থাৎ ভুল পথে পরিচালিত করে সেটি ব্যতিক্রমী। অর্থাৎ এই লাল রঙের সঙ্গে বিশেষণ 'ভালো'র সংযোগই একে করেছে রহস্যময়, বর্ণচোরা (যদিও তা লাল) ও অস্পষ্ট। আবার যেখানে রঙের উজ্জ্বল বর্ণবৈভব ফবিস্টদের মতোই ব্যবহৃত হয়, এবং তা সদৃঢ় কাঠিন্যকে প্রকাশ করে ষাটের কবিতায় তা ইম্প্রেশনিস্ট আবহকে অস্বীকার করেনা। যেমন,

তারি সন্ধ্যালোকে
টালির উপর থেকে রঙচঙে একটি মোরগ লাফিয়ে নামলে
　　মনে হয়
কোনো শিল্পী বর্ণস্নাত করেছে মোরগটিকে
অতি যত্নে, লাল পরিশ্রমে

(ঐ, লণ্ঠন)

এখানে রঙচঙে মোরগের বর্ণাঢ্যতা, বর্ণস্নাত উজ্জ্বল রূপান্তর পেয়েছে কঠিন্য সুদৃঢ় রেখাচিত্র। মূলত এ ধরনের বর্ণোজ্জ্বল প্রাকশ ফবিস্টদের অন্বিষ্ট মাধ্যম।

মোরগের লাফিয়ে পড়ার দৃশ্যও বলীয়ান জীবনের কঠিন প্রকাশ। কিন্তু সন্ধ্যার প্রচ্ছায়া ও কোমল আলোক বর্ণবিভা এই প্রবল রঙের অভিঘাতে এনেছে অস্পষ্টতা। মোরগের কঠিন উজ্জ্বল রঙ সান্ধ্যকালীন ধূসরতায় অনেকটা ম্লান। শিল্পীর 'লাল পরিশ্রমও' একটি ইতিবাচক কোমলতার ইঙ্গিত বহন করে।

এছাড়াও ষাটের কবিতায় রঙের বিচিত্র প্রকাশ কবিদের মনোজগতের বৈশিষ্ট্যের স্মারক হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানি সামরিক অবদমন, নিরস্তিত্ব চেতনা, উন্মূল বোহেমীয় মানসিকতা, দুঃখ ও হতাশাবাদী মনোভঙ্গি, সর্বোপরি নঞর্থক জীবন চেতনায় তাঁদের ব্যবহৃত রঙও হয়ে উঠেছে একই চিন্তনের অনুষঙ্গবাহী। 'কালো রঙ ব্যবহৃত হয়েছে অস্তিত্বের বিপন্নতায় মনোশ্চক্ষুর উন্মীলনহীন অন্ধত্বে, সময়ের দীর্ঘ অবরুদ্ধতায়। যেমন,

১.

কালো ডায়ালে আমার আঙুলে ঐন্দ্রজালিক
ঘুরছে নম্বরগুলি,
(শহীদ কাদরী, টেলিফোনে আরক্ত প্রস্তাব)

২.

শীতল, কালো ময়লা, সৌরভের প্রিয়তমা (ঐ, আলোকিত গণিকাবৃন্দ)

সোনালি ও লাল রঙের ব্যবহার কখনো কখনো প্রেম, স্বাপ্নিক জীবনের ইঙ্গিত এবং জীবনানুভূতির ইতিবাচকতায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

১.

ছিলাম পৃথিবীর শেষ সুন্দরীর মাথার ভিতরে সোনালি মাছ
(আবদুল মান্নান সৈয়দ, শহরে অচেনা মাছ)

২.

সোনালি কাঁকড়ার তীক্ষ্ণ দাঁড়া ঘিরে বইছে সময়
(রফিক আজাদ, সোনালি কাঁকড়ার দাঁড়া : ২

৩.

দেয়ালে ছায়ায় নাচ সোনালি মাছের
(শহীদ কাদরী, স্মৃতি : কৈশোরিক)

৪.

পাঁচটি লাল ফুল আনে সৌরভের রাত (ঐ, ইন্দ্রজাল)

প্রিজমসদৃশ বহুবর্ণিল বিচ্ছুরণে প্রতিসাম্য সৃষ্টি করে নতুন ব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায় এ-দশকের কবিতায়। ফলত অসংখ্য রঙের মধ্যে একটি রঙের কেন্দ্রীভূত রঙ কবিতার ভাব বিন্যাসে আনে দ্যুতিময় রহস্যময়তা। যেমন, লাল, নীল সবুজ প্রভৃতি সংমিশ্রণে রশ্মিময় বর্ণবৈভব-

> কালো দাড়ির ভিতরকার ফেটে পড়া হাসির মতো সরোবর থেকে
> লাল-নীল সবুজ মাছ তাকে জেনো আমার যৌবন-কাঁচের ভিতরে
> জলে আঁশ ঝেড়ে ফেলে জ্বলতে-জ্বলতে চলে যায় তৎপর মাছের
> ঝাঁক।
>
> (আবদুল মান্নান সৈয়দ, জীবন আমার বোন, জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ)

ভাস্কর্য সদৃশ প্রতিমা নির্মাণের ছাঁচে শব্দকে ফেলে আবেগকে প্রবহমান করে রচিত হয়েছে কবিতা। অর্থাৎ একটি মাত্র ভাব বা কথাকে একটি প্রবহমান ধারায় প্রলম্বিত করে বাক্যবিন্যাসের বৈচিত্র্য ও দূরান্বয় সৃষ্টি করে কবিতা রচনার নিরীক্ষা ও এ দশকের একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা একটি মাত্র দীর্ঘ বাক্যে বোঝাতে গিয়ে কবির বাক্-বিন্যাস হয় এরকম, পুরো কবিতাটিই এখানে তুলে ধরা হলো :

বারান্দার ত্রিভুজ কোণে
খোলা জানালার সারি সারি শিকের ফাঁক থেকে
দেয়ালের ঘুলঘুলির ফোকর দিয়ে
হতাশার একটি রন্ধ্র দিয়ে
স্তনের নিঃসঙ্গতায় দাঁড়িয়ে
নিষ্কাম ভাঁড়ের বিস্ময়ে
মরণের টানেল থেকে
ইচ্ছা কি অনিচ্ছায়
দেখি স্নাতরত
একটি নারী,
নগ্ন
(শহীদ কাদরী, নগ্ন)

নগ্ননারীর দেহ সৌষ্ঠব ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে কবি যতিচিহ্নহীন প্রবহমান ভঙ্গিতে, জটিল বিন্যাসক্রম উন্মোচন করতে করতে প্রত্যক্ষ করেন নগ্ননারীকে। এই শরীর উন্মোচনের মতোই কবির শব্দ ও উপমানবিন্যাসও অস্পষ্টতা থেকে ক্রমশ স্পষ্টতায় উপনীত হয়েছে।

কাবতার নামাঙ্কণেও ষাটের কবিরা আপাতবিরোধী মানসিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। না বিপ্লবী না প্রেমিক (নির্মলেন্দু গুণ), কুসুমিত ইস্পাত (হুমায়ুন কবির), জন্মান্ধ কবিতা গুচ্ছ' (আবদুল মান্নান সৈয়দ) প্রভৃতি নামকরণে এ বিরোধ লক্ষ করা যায়। মূলত ষাটের কবিদের যাত্রারম্ভ রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে হলেও তাঁদের শেষ আশ্রয় জোটে হাল্কা রোমান্টিসিজমে। এ জন্য অবশ্য যুগমানস, কবি চেতনার অবরুদ্ধ মানসিকতাই দায়ী।

বস্তুত ষাটের কবিতার প্রকরণ বৈচিত্র্য কবিদের শৈল্পিক এষণাপ্রযুক্ত সচেতন কাব্য প্রয়াসেরই ফল। অবরুদ্ধ সময়, হতাশা, ক্লেদ, গ্লানি, জৈবনিক অচরিতার্থতা শৈল্পিক যন্ত্রণায় কবিতায় পেয়েছে নতুন মাত্রা। কবিদেরকে জীবন যেমন আকর্ষণ করেছে, তেমনি টেনেছে মৃত্যু জরা এবং হতাশা। ব্যাকরণিক সাফল্যের ব্যাপক সিদ্ধি না ঘটলেও ষাটের দশকেই আমাদের আধুনিক চৈতন্যের প্রকৃত বিস্তার এবং বৈচিত্র্যের সূচনা ঘটে। দৈনন্দিন গাদ্যিক ভাষায়, ছন্দ নিরীক্ষায় কবিতা পেয়েছে অধিকতর জীবনবাস্তবতার স্পর্শ। সেই অর্থে ষাটের কবিতা বাংলা কবিতার ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

তথ্যনির্দেশ

১ সৈয়দ আকরম হোসেন। *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ১৯৮৫। ঢাকা; বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪১

২ পূর্বোক্ত।

৩ মাসুদুজ্জামান। *বাংলাদেশ ও পশ্চিমবাংলার কবিতা: তুলনামূলক ধারা*। ১৯৯৩। ঢাকা: বাংলা একাডেমী পৃ. ২৬২

৪ Sad Generation Vol 1 1964

৫ সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৬ The Silence is God. The absence is God, God is the loveliness of man. There was no one but myself: I alone decided on evel; Lucifer and the lord, Act3, Scence Ten, kitty Black অনূদিত (Penguin Books) উদ্ধৃত: বিমকুমার মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্য বিবেক*, দেজ পাবলিশিং: কলকাতা, পৃ. ২৪১

৭ মাসুদুজ্জামান। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২

৮ উদ্ধৃত: বিশ্বজিৎ ঘোষ, নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, যুক্ত সংখ্যা, অক্টোবর ৯৫-ফেব্রুয়ারি জুন ৯৬ পৃ. ৪

৯ পূর্বোক্ত।

১০ The alienation of the artist and his despair at the decay of the world are two sides of one cain; Frank kermode, *Romantic Image*. (Newyork, 1958) P. 7.

১১ Ibid, P.5.

১২ Sad generation, Ibid.

১৩ *শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা*। বুদ্ধদেব বসু অনূদিত। ১৯৮৮। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং পৃ. ২০।

১৪ পূর্বোক্ত পৃ. ১৯

১৫ পূর্বোক্ত . পৃ. ৬৩

১৬ পূর্বোক্ত, বিষাদগীতিকা. পৃ. ১৬৭

১৭ মাসুদুজ্জামান, পূর্বোক্ত পৃ. ৩১০

১৮ M. H Abrams. *A Glossary of literary Terms*. 1993. A Prism Indian edition, P. 205.

১৯ Ibid.

২০ মুখবন্ধ সংবর্ত, *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ*। ১৯৯৩। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, পৃ. ১৯৪

২১ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কাব্যের মুক্তি। স্বগত: *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ*। ১৯। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, পৃ. ২৩।

২২ Samuel Taylor Coleridge. *Biographia literaria*. ed. J. Showerass. Vol. II. chapter XVII. 1969. London. P. 41

২৩ Frank kermode, *Romantic Image*. (Newyork 1958) P. 5

২৪ জ্যোতি ভট্টচার্য, চিত্রকল্প বিচার : আরেকটি ভূমিকা, *আকাদেমি পত্রিকা*। নবম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৩। কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ১০।

২৫ বেগম আকতার কামাল। ইম্প্রেশনিজম ও বিষ্ণু দে-র কবিতা, *সাহিত্য পত্রিকা*, পঁয়ত্রিশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৮. পৃ. ৫৮

২৬ জীবনানন্দ দাশ। বোধ, ধূসর পাণ্ডুলিপি: *কবিতাসমগ্র*। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ১৯৯৪। ঢাকা: অবয়ব প্রকাশনী, পৃ. ৭৯

২৭ Herbert Read, *Collected Esseys in literary crilicism*. P. 50

২৮ বেগম আকতার কামাল, সমর সেনের কবিতায় রঙের ব্যবহার। পূর্বোক্ত। আটত্রিশ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪০১, পৃ. ১০১।

২৯ পূর্বোক্ত।